ঃ এই সংখ্যায় ঃ
১) খাদ্যে ভেজাল ঃ হাতে কলমে ধরবেন কিভাবে।
২) পরমাণু শক্তি কেন্দ্র ঃ পৃথিবীর কোথাও নয়।
৩) ইবন-এ-বতুতা ৪) রিপোর্ট

বিজ্ঞান অন্বেষক

গ্রাহক মূল্য
বার্ষিক ১৫ টাকা, যোগাযোগ ঃ বিজ্ঞান অন্বেষক, প্রযত্নে : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড, (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া-৭৪৩১৪৫ জেলা ঃ উত্তর ২৪ পরগণা।

বর্ষ-৮ সংখ্যা-৩ মে-জুন / ২০১১ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য : ২

উত্তরবঙ্গের অরণ্য সম্পদ

বক্সা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট

পশ্চিমবঙ্গের ২য় এবং উত্তরবঙ্গের ১ম ব্যাঘ্র প্রকল্প (Tiger Project) এলাকা হল এই বক্সা বাঘবন। জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমাতে অবস্থিত এই বক্সা বনভূমি অঞ্চল। বর্তমানে এর আয়তন ৭৫৯ বর্গ কিঃমিঃ

এরপর 2 পাতায়

বক্সা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টের কোর এরিয়ার জঙ্গল

জি.এম ফসল এবং আমার যেখানে দাঁড়িয়ে

জেনিটিক্যালি মডিফায়েড বা জিনগত ভাবে পরিবর্তিত অর্গানিজম থেকেই তৈরি হয় জেনেটিক্যালি মডিফায়েড ফুড। জি.এম ফুড অর্গানিজম বলতে রিকমবিন্যান্ট ডি.এন.এ প্রযুক্তি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে বীজের ডি.এন.এ (DNA) র বিন্যাস বদলে তাকে আরো উন্নততর করে তোলা হয় আমাদের প্রয়োজন অনুসারে। এইভাবে জিনের (যা বংশগতির ধারক ও বাহক) গঠনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে বীজের মধ্যে বিশেষ কিছু গুণাগুণ সঞ্চারিত করা হয়। এই পদ্ধতিতে ফসলের পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করা গাছের উপর কীট পতঙ্গের আক্রমণ প্রতিহত করা যেতে পারে। গবেষণার প্রথম দিকে যে সমস্ত জিনের

এরপর 5 পাতায়

জাপানে ভূমিকম্প ও পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনা ঃ পরমাণু চুক্তির কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকছে না

জাপানে গত ১১ই মার্চ একই সঙ্গে ভূমিকম্প ও সুনামীর আঘাত জীবনহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অপরিসীম। কিন্তু তা ছাপিয়ে এক ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে বিধ্বস্ত দেশটি। জাপানের পূর্ব ও পশ্চিম

এরপর 9 পাতায়

মশা মারার ধূপ

মানব জীবনে নানা সমস্যার মধ্যে খুব পরিচিত মশা এক চিরন্তন সমস্যা। মশার প্রাদুর্ভাব একেবারে নির্মূল করা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এদের ধ্বংস করার জন্য কত নিরন্তন চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দেশ-বিদেশের সব গ্রামগঞ্জ, শহর এলাকায় মশা বাড়ছে। সংখ্যাটা কোথাও বেশি, কোথাও কম। আমাদের দেশে খুব গরম ও শীতে অতটা বাড়ে না, কিন্তু বর্ষা নামার পর অনুকূল পরিবেশে মশার ভনভনানি বেশি তা বেশ ঠাহর পাই। মশার কামড়

এরপর 6 পাতায়

অরণ্য সম্পদ.... 1 পাতার পর

১৯৮২-৮৩ সালে সরকারিভাবে ব্যাঘ্র প্রকল্প হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বনভূমির ৩১৫ বর্গ কি.মি. কোর এলাকার ১১৭ বর্গ কিঃমিঃ এলাকাকে জাতীয় উদ্যান এবং বাকি অংশকে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে ১৯৮৬ সালে ঘোষণা করা হয়।

১৮৬৬ সাল থেকে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল এই অরণ্য। বনভূমির বেশির ভাগটাই পাহাড়ের ঢালে এবং পাদদেশে 'ভাবর' 'তরাই' অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫০ মিটার থেকে ২০০০ মিটার পর্যন্ত। অভয়ারণ্যটি ক্রান্তীয় আদ্র পর্ণমোচী মৌসুমী শাল অরণ্য অঞ্চলে পড়েছে। অরণ্যের মাঝখানে অনেকগুলি নদী বয়ে গেছে যাদের মধ্যে পানা, ডিমা, রায়ডাক, সংকোশ, বালা, গাবুর ও বাসরা উল্লেখযোগ্য। এখানে সমভূমি ও পাহাড়ের তলদেশে বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে চিলৌনি, চিক্রাশি, বহেড়া, সিধা, টুন, বালি, লসুনে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানকার ভূখন্ড জলনিকাশী ব্যবস্থা ও মাটির আদ্রর্তার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ দেখা যায়। যেমন—নদী ভিত্তিক অঞ্চলে খয়ের শিশু, শিমূল, শিরিষ দেখা যায়। আবার পার্বত্য বনভূমিতে কার্টুস, মান্দালে, লাম্পতি, কিম্বু, পানিসাজ, সোকুল প্রভৃতি গাছপালা দেখা যায়। এখানে বেশ কিছু প্রাচীন, ঐতিহ্যময়, বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে।

বন্যপ্রাণীদের মধ্যে এখানে ডোরাকাটা-রয়ালবেঙ্গল টাইগার ছাড়াও চিতা বাঘ, বনবিড়াল, বুনোকুকুর প্রভৃতি মাংশাসী প্রাণীর উপস্থিতি চোখে পড়ে। এছাড়া গাউর, চিতল হরিণ, ভালুক, থর (হরিণ জাতীয় প্রাণী), বুনো ছাগল, সম্বর, কাকর হরিণ ও বিভিন্ন প্রকারের সাপ, গো-সাপ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

এখানে স্থানীয় পর্যায়ের কিছু পাখি ছাড়াও বেশ কিছু পরিযায়ী পাখির দেখা মেলে যেমন-ব্লু-রক্ থ্রাশ্, ব্ল্যাক বার্ড, হরিয়াল, ধনেশ, সাদাগাল বুলবুল, হাজারিকা, ভীমরাজ, মদন প্রভৃতি। নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস ভ্রমণের জন্য আর্দশ সময়। এই ব্যাঘ্র প্রকল্পে বেশ কয়েকটি বন বিশ্রামাগার রয়েছে। এর জন্য ক্ষেত্র অধিকর্তা বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প অধিকার পোঃ রাজাভাত খাওয়া, জেলা - জলপাইগুড়ি এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এখানকার নিকটবর্তী রেলস্টেশন হল—আলিপুরদুয়ার জংশন ও নিউ আলিপুর জংশন।

জাতীয় উদ্যান (National Park)

উত্তরবঙ্গে মোট ৩টি জাতীয় উদ্যান (National Park) আছে যথা—সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান, নেওড়া উপত্যকা জাতীয় উদ্যান এবং গরুমারা জাতীয় উদ্যান।

সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান

মাত্র ৭৯ বর্গ. কি.মি. বনাঞ্চলকে ঘিরে ১৯৮৬ সালে অঞ্চলটিকে জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা দেওয়া হয়। পূর্বহিমালয়ের পাহাড়ী কোলে নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিম সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলে এই জাতীয় উদ্যান অবস্থিত।

জাতীয় উদ্যানটি দক্ষিণ রিম্বিক সান্দাকফু, শিরি এবং ফালুটের বনাঞ্চল নিয়ে গঠিত। এখানকার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৩০০ মিটার—৩৬৫০ মিটার পর্যন্ত। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠে। শীতকালে ১ ডিগ্রী থেকে শূন্যের নিচে ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত থাকে। এখানে মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল। সান্দাকফুতে বছরে গড় বৃষ্টিপাত ৩,১৫০ মি.মি.। এখানে ৩০০০ মিটারের ওপরের উচ্চতায় শীতকালে তুষারপাত হয়। দুটি নদী যথা-'ছোট রঙ্গিত' এবং 'রাম্মা' এখানকার প্রধান নদী, এছাড়া রয়েছে দুটি বড় ঝোরা। যথা—'শিরিখোলা' এবং 'লোধামা খোলা'। এছাড়া ছোট ছোট কিছু 'ঝোরা' বা 'খোলা' যথা—'সিং প্রতাপ খোলা' ও 'বিখুখোলা'এই জাতীয় উদ্যানে অপরুপ সৌন্দর্য্যের অধিকারী। এই বৈচিত্র্যময় জাতীয় উদ্যানে ওক, হেমলক্, রুপালি দেওদার, রুপালি ফার, বার্চ প্রভৃতি বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ পাওয়া যায়। আর্দ্র রডোডেনড্রন ও জুনিপারের বাহারি ফুলের জন্য এই জাতীয় উদ্যান বিশ্বখ্যাত।

এখানে আনুমানিক ৭০টি প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্তন্যপায়ী প্রাণীটি হল রিল লাল পান্ডা'। লালপান্ডা এই মুহূর্তে বিশ্বের কেবলমাত্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি এলাকাতে অল্প কিছু সংখ্যায় পাওয়া যায়—এই জাতীয় উদ্যান তার মধ্যে একটি। এছাড়া এখানে বাঘ, চিতাবাঘ, চিতা-বিড়াল, সোনালী বিড়াল, মেঘচিতা, বনবিড়াল, সেরু, গোরাল, পাহাড়ি কালো ভালুক প্রভৃতি পাওয়া যায়। উভয়চর জাতীয় বিড়াল প্রাণী স্যালাম্যান্ডার (লেজযুক্ত ব্যাঙ) এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাঙও রয়েছে এখানে।

এই উদ্যানটি দার্জিলিং জেলার উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। দার্জিলিং এর 'ঘুম' রেল স্টেশন থেকে একটি পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে ২৬ কি.মি. দূরে মানেভঞ্জন। এই মানেভঞ্জন থেকে সিঙ্গোলিলা জাতীয় উদ্যানের প্রবেশ পথ। এখান থেকে একটি গাড়ি চলা পথ টংলু ও সান্দাক্ফু হয়ে ফালুট পর্যন্ত গেছে। আর একটি রাস্তা মানেভঞ্জন থেকে ফালুট হয়ে রিম্বিক পর্যন্ত গেছে।

নেওড়া উপত্যকা (ভ্যালি) জাতীয় উদ্যান

এই উদ্যানটি সিকিম ও ভুটান সংলগ্ন নেওড়া নদীর উপত্যকায় দার্জিলিং জেলার উত্তর পূর্বে কালিম্পং মহকুমার অন্তর্গত। ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসে এই বনাঞ্চলটি জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা লাভ করে। এই জাতীয় উদ্যানটি ৩৫০ মিটার থেকে ৩১৭০ মিটার উচ্চতাযুক্ত। এই জাতীয় উদ্যানের মোট আয়তন প্রায় ৮৮ বর্গ কি.মি.। এই বনভূমিটি বহিঃহিমালয়ের অংশ বিশেষ। নেওড়া নদী এই অঞ্চলের মূল নদী-যার নামেই এই উদ্যানটির নাম। এছাড়া 'খসুম', 'ধাউলী' 'পঞ্চপোখরি' এবং 'নাজুর খোলা' প্রভৃতি ছোট ছোট ঝোরাও এই উদ্যানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এখানে বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা উচ্চতার সাথে তারতম্যযুক্ত হয়। এখানেও মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ষাকাল লক্ষ্য করা যায়। শীতকালে পর্বতের পাদদেশে তাপমাত্রা ১৫

এরপর 3 পাতায়

অরণ্য সম্পদ.... 2 পাতার পর

থেকে ২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং ওপরের দিকে ০ থেকে ১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়।

এখানে শুষ্ক মিশ্র বন, আর্দ্র মিশ্রবন, মধ্য পার্বত্যবন, সরলবর্গীয় বন ও রডোডেনড্রন-এর বন প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের বনাঞ্চল দেখা যায়। এছাড়া খয়ের, শিশু, শিরিষ প্রভৃতি বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ লক্ষ্য করা যায়।

উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যে ভরপুর এই উদ্যানটি। প্রাণীদের মধ্যে লালপান্ডা, চিতাবাঘ, বাঘ, মেঘচিতা বিভিন্ন বিড়াল জাতীয় প্রজাতি, কাঠবিড়ালী, বনরুই জাতীয় প্রাণী, কাকর হরিণ, সম্বর, গোরাল, সেরু, গাউর ও বিভিন্ন প্রকার পাখি এখানে পাওয়া যায়।

উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে কম, অব্যবহৃত অরণ্য হল এই জাতীয় উদ্যান। এই অঞ্চলের নৈসর্গিক পাহাড়, বনভূমি ও বন্যপ্রাণী পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষনীয়। নিকটবর্তী রেলস্টেশন চালসা। শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ার মিটার গেজ লাইন যা জাতীয় উদ্যান থেকে প্রায় ৩০ কি.মি. দূরে অবস্থিত। বাগডোগরা ১০০ কিমি দূরে অবস্থিত।

এই উদ্যানে ভ্রমণের জন্য বিভাগীয় বনাধিকারিক, বন্যপ্রাণী বিভাগ, দার্জিলিং এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

গরুমারা জাতীয় উদ্যান

১৯৪২ সালে এই বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত বনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এরপর ১৯৪৯ সালে এবং ১৯৭৬ সালের জুন মাসে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য মর্যাদা পায়। এই জাতীয় উদ্যানটি জলপাইগুড়ি জেলায় মাত্র ৮৯.৯৯ বর্গ কি.মি. জায়গা জুড়ে অবস্থিত। এই অঞ্চলের প্রধান দুটি নদী 'মুর্তি' ও 'জলঢাকা' এর নিচু প্লাবন ভূমিতে উদ্যানটি অবস্থিত।

এখানকার উচ্চ বনভূমিতে শাল, চিলৌনি, বহেড়া, জিওল, ওদাল, জাম, চিক্রাশি, কাটুস, সিধা প্রভৃতি বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়। কিন্তু নীচু এলাকায় শিমুল, শিরিষ, খয়ের প্রভৃতি উদ্ভিদ লক্ষ্য করা যায়। এখানে ২০ ভাগ অংশ তৃণভূমি। এখানকার ঘাসের মধ্যে উলুঘাস, নলখাগড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সারা পশ্চিমবঙ্গে জলদাপাড়া অভয়ারণ্য ছাড়া একমাত্র এখানেই ভারতীয় এক শৃঙ্গ গন্ডার পাওয়া যায়। বন্যপ্রাণী বৈচিত্র্যে অনন্য এই জাতীয় উদ্যানটি। অন্যান্য বুনো প্রাণীদের মধ্যে বাঘ, হাতি, চিতাবাঘ, গাউর, ভালুক, বুনোশুয়োর, সম্বর, কাকর হরিণ প্রভৃতি স্তন্যপায়ী পাওয়া যায় এখানে। এছাড়া সরীসৃপদের মধ্যে গো-সাপ, ময়াল বা অজগর, গোখরো সাপ প্রভৃতি দেখা যায়। এখানে পরিযায়ী পাখিদেরও সমাহার। শীতকালে বিভিন্ন প্রজাতির দেখা মেলে। এখানকার উল্লেখযোগ্য পাখি হল—বালিজাং, ধনেশ, ন্যাস, ওয়ারব্লার, মেরুন ওরিন্তল প্রভৃতি।

এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নতমানের। গরুমারা জাতীয়

এরপর 4 পাতায়

উত্তরবঙ্গের চা বাগান

অরণ্য সম্পদ.... 3 পাতার পর

উদ্যান থেকে নিকটবর্তী শহর চালসা ও লাটাগুড়ি মাত্র ১২ কি.মি. দূরে। জাতীয় উদ্যানটির দক্ষিণ দিক দিয়ে ৩১নং জাতীয় সড়ক চলে গেছে। নিকটবর্তী রেলস্টেশন মাল জংশন ও চাল্‌সা। জাতীয় উদ্যানের মাঝে বনবিভাগের বিশ্রামাগার আছে। বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলার সাথেই রয়েছে নজরমিনার ও লবণের ঢিবি। এছাড়া বাইরের দিকে জঙ্গলঘেঁসা প্রচুর কটেজ ও লজ রয়েছে। বন বাংলো বুকিং এর জন্য বিভাগীয় বনাধিকারিক, জলপাইগুড়ি বন্যপ্রাণী বিভাগ-২ এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

উত্তরবঙ্গ জৈববৈচিত্র্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে যুগ যুগ ধরে। তবে বর্তমানে অত্যধিক জনসংখ্যার চাপ, বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের দরুন এবং বেশ কিছু দুষ্টচক্রের সক্রিয়তার কারণে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এখানকার

বক্সা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টের ট্রেকিংয়ের রাস্তা

জৈববৈচিত্র্য। বনঘেঁষা এলাকায় এরা সহজেই আবাসস্থল গড়ে নিচ্ছে। প্রতিনিয়ত ক্ষতি হচ্ছে বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থল ও যাতায়াতের বিভিন্ন করিডর। বনাঞ্চলের কোর এলাকাতেও খাদ্য উদ্ভিদ প্রাণীর অভাব ঘটছে। এসব কারণে উত্তরবঙ্গে প্রতিনিরতই বন্যপ্রাণীদের সংঘাত অনিবার্য্য হয়ে উঠছে। বন্য পশু বিশেষ করে হাতি বাইসন এবং চিতাবাঘ মাঝে মধ্যেই বসতিপূর্ণ এলাকায় চলে আসছে—ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উভয়ই। এছাড়া বনাঞ্চলকে গোচারণভূমি হিসেবে ব্যবহার করায় বহু সংক্রামক ব্যধি (যেমন-অ্যানথ্রাক্স) বন্যপ্রাণীদের মাঝে সহজেই ছড়িয়ে পড়ছে। রেল ও সড়ক পথে বহু পথ দূর্ঘটনা ঘটছে যেখানে বহু বন্যপ্রাণী যথা হাতি, বাইসন প্রতি বছর প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছে।

বিশ্বের আদিম এই অরণ্যাঞ্চলকে বাঁচাতে সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত ধরনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। সাধারণ মানুষের মধ্যে বন ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে সম্যক ধারণা দরকার। সৎ মানসিকতা নিয়ে সরকার সহ সব শ্রেণীর মানুষের এই বনভূমি বাঁচাতে এগিয়ে আসা উচিৎ নিজেদের স্বার্থেই।

—রাজা রাউত, জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব
ফোন - ৯৪৭৪৪১৭১৭৮ আলোকচিত্র ঃ জয়দেব দে

আবেদন

জানুয়ারী ২০০৩। বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের উদ্দেশ্যে ৮ পাতার পত্রিকা। দাম ১ টাকা। ধারাবাহিকভাবে ৮ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। রাজ্য জুড়ে চাহিদা বেড়েছে। রাজ্যের বাইরেও পত্রিকার পাঠক রয়েছে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকারা পত্রিকাটির সঙ্গে এই ৮ বছরে পরিবারের মতো হয়ে গেছেন। পত্রিকা যখন গ্রাহকরা ডাক মারফৎ পান, প্রশংসা, মতামত টেলিফোনে পাই। আমরা আরও একবার বলছি আপনারা মতামত লিখুন। পরিবেশ, বিজ্ঞান ও আপনার অঞ্চলের পরিবেশ দূষণ, ছবি, সমীক্ষা, বিজ্ঞানের খবর নিয়ে কলম ধরুন। সোজা আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। বাৎসরিক সম্মেলনে অবশ্যই আসবেন। আগাম জানাব।

এবারে আবেদন করছি। ২০১১ সালের মে-জুন সংখ্যা থেকে পত্রিকা ১২ পাতা হচ্ছে। কাগজের মান ভালো হচ্ছে। দাম বাড়াতে বাধ্য হচ্ছি। প্রতি সংখ্যা ২ টাকা। পাঠকদের মতামত ও সহযোগিতা চাই।

—পরিচালকমন্ডলী, বিজ্ঞান অন্বেষক

ঃ পত্রিকা যোগাযোগ ঃ
রাজা রাউত (জলপাইগুড়ি)-৯৪৭৪৪১৭১৭৮,
তুহিন শুভ্র মন্ডল (বালুরঘাট)-৯৪৭৫৯৩১২৯০
অভিজিৎ অধিকারী (চাকদহ)-৯৭৪৯৪৮৬৬৪৯,
ময়ূখ ব্যানার্জী (কোচবিহার)-৯৪৭৪৮৩১০৮৬
সৌম্যকান্তি জানা (কাকদ্বীপ)-৯৩৩৪৫৭০১৩০,

ঃ পত্রিকা যোগাযোগ ঃ
সুরজিৎ দাস (কাঁচরাপাড়া)-৯৪৩২৬৮৬৫১০
পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় (ত্রিবেণী)-৯৪৭৭০৬৪৭০৪
অমিত কুমার নন্দী (চুঁচুড়া)-৯৪৩৩৯০৬৬২৩
বিবর্তন ভট্টাচার্য্য (নদীয়া)-৯৪৩৪১১০৯৬৯
চন্দন সুরভিদাস (কলকাতা)-৯৪৭৭৫৮৯৪৫৬

জি.এম. ফসল

1 পাতার পর

মধ্যে এই গুণগুলি আছে সেইগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। এরপর সেই জিনগুলিকে এক অর্গানিজম থেকে অন্য অর্গানিজমে প্রতিস্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে আলাদা প্রজাতির জিন অন্য প্রজাতিতে প্রতিস্থাপন সম্ভব। এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র কোন নতুন জিন প্রতিস্থাপনের সঙ্গে কোনো কোনো জিনকে একেবারে বাদ দেওয়া যেতে পারে। এই পুরো প্রক্রিয়াটিই হল জেনেটিক টেলারিং (Genetic Tailoring)। অর্থাৎ ঠিক যেমন ভাবে Tailor জামা-প্যান্ট বানানোর দোকানে প্রয়োজন মতো মাপ নিয়ে আমাদের চাহিদা মতো জিনিষ বানান। এক্ষেত্রে ঠিক তেমন ভাবে কৃষি প্রযুক্তিবিদ কৃষকদের চাহিদা অনুসারে তাদের সমস্যার সমাধান করে প্রয়োজন মতো জাত উদ্ভাবন করেন। পরিবর্তিত জিন সম্পন্ন যে সমস্ত ফসলের চাষ হচ্ছে সেগুলি হল—টম্যাটো, সোয়াবিন, বেগুন, তুলো, ধান, সুগার বীট প্রভৃতি।

জি.এম ফসলের প্রয়োজন কেন?

বস্তুত পক্ষে কৃষক বন্ধু ও যারা এই ফসল ব্যবহার করেন উভয়ের স্বার্থেই জি.এম ফসলের চাষ করা প্রয়োজন। ফসলের জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে এমন উন্নততর জাত তৈরি করা হয় যা কীটপতঙ্গ ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম, প্রচন্ড ঠান্ডা, লবনাক্ত মাটি ইত্যাদি অবস্থায় ও ভালো ফলন দিতে পারে।

যেমন কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধের জন্য তুলো বীজের মধ্যে *Bacillus thuringiensis* (বিটি) ব্যাকটেরিয়া থেকে টক্সিন নিঃসরণকারী জিন প্রতিস্থাপন করা হয়। এই টক্সিন দিয়েই অনেক কীটনাশক তৈরি করা হয়। কিন্তু গাছের মধ্যে এই টক্সিন থাকলে বাইরে থেকে আর কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে জীনের মধ্যে ভাইরাস প্রতিরোধী গুণ থাকলে আর ভাইরাসের আক্রমণ ঘটবে না। এক ধরণের সামুদ্রিক মাছের জিন আলু ও তামাক গাছকে প্রচন্ড ঠান্ডাতেও রক্ষা করে। অন্যদিকে পুষ্টিগুণ বাড়াতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পিছিয়ে থাকা ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রাত কানা রোগের প্রার্দুভাব বেশি, তাই এই সমস্যাটিকে দূর করতে ধানের এমন প্রজাতি তৈরি করা হয়েছে। যাতে ভিটামিন এ পরিমাণ বেশি। কিছু কিছু ফসলের ক্ষেত্রে অ্যালার্জি হয়। তাতেও এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ফসল বেশিদিন টাটকা রাখা, তাড়াতাড়ি ফসল পাকানোতেও ভরসা জেনেটিক্যালি মডিফায়েড ফসলের।

কী কী কারণে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড ফসলের উপর আপত্তি?

জি.এম ফসলের প্রভাব মূলতঃ পড়বে পরিবেশ, মানুষের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির উপর। স্বাস্থ্যের উপর জি.এম ফসলের প্রভাব—

১) সম্ভাব্য অ্যালার্জিক রিঅ্যাকসান।

২) মানুষের শরীরে খাবারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের জীন ঢুকে যাওয়ার সম্ভাব্য পরিণাম।

৩) কোনো ফসলের সাধারণ প্রজাতি ও জি.এম প্রজাতির মধ্যে জিনের আউট ক্রশিং বা পরস্পরের মধ্যে মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে সেই সম্পর্কে বির্তক থেকেই যায়। উন্নত দেশগুলিতে সাধারণ ও জি.এম প্রজাতিগুলিকে চিহ্নিত পৃথক জমিতে চাষ করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সেটি মেনে চলা একেবারেই অসম্ভব।

অপর পক্ষে পরিবেশবিদ্‌দের চিন্তা এই ধরণের ফসল থেকে জীন বন্যপ্রাণীদের শরীরে প্রবেশ করে পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে। পরিবেশে সব ধরণের কীটপতঙ্গই ক্ষতিকারক নয়। অনেক উপকারী অর্থাৎ বন্ধু কীটপতঙ্গ আছে। এইগুলি অবলুপ্ত হলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী। আবার কীটপতঙ্গের জীনের মিউটেশন ঘটে নতুন প্রজাতি তৈরি হতে পারে আর জি.এম থেকে উৎপন্ন টক্সিনে ক্ষতি করতে পারছে না। ফলে ফসল কাটার পর পরিবেশে এই ধরণের জিন রয়ে যাবে এবং তার জন্য চরম মূল্য দিতে হবে আমাদের। এই ধরনের গবেষণা, উন্নয়ন এবং পেটেন্ট মূলতঃ করছেন বিদেশী বহুজাতিক সংস্থা। এই ধরণের ফসল চাষে বীজের দাম বেড়ে যাবে। ফলে ক্ষুদ্র চাষী ভাইদেরই ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। এছাড়াও শস্যের মূল জীন শিকল (DNA Chain) এর পরিবর্তন ঘটিয়ে এমন বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে যাকে প্রান্তিক বীজ (Terminated Seed) বলা হয়, যা থেকে উৎপাদিত বীজ নিষ্ক্রিয় হয় অর্থাৎ নতুনভাবে আর চারা জন্মায় না। আবার এই ধরণের চাষ শুরু হলে দেখা যাবে কৃষক বন্ধুরা একটি বা দুটি প্রজাতির চাষে উৎসাহ দেখাচ্ছেন ফলে আমাদের দেশী জাতগুলি সব হারিয়ে যাবে।

ভারতে জি.এম ফসলের নিয়ন্ত্রণের ভার কাদের হাতে?

কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রক 'পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইনের অন্তর্ভূক্ত' রুলস ফর দি ম্যানুফ্যাকচার/ইউজ/ইমপোর্ট/এক্সপোর্ট অ্যান্ড স্টোরেজ অফ হ্যাজার্ডাস মাইক্রোঅর্গানিজমস, জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড অর্গানিজম অ্যান্ড সেলস্, ১৯৮৯ মোতাবেক জিএম ফসল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়। কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রক, জৈব প্রযুক্তি দপ্তর ও কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন সংস্থা প্রয়োজনীয় বিধিগুলি প্রয়োগের দায়িত্বে রয়েছেন।

আন্তর্জাতিক নিয়ম

জি.এম ফসল সম্পর্কে এই মুহূর্তে কোনো আর্ন্তজাতিক নিয়ম/ব্যবস্থাপনা নেই। তবে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (F.A.O.) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (W.H.O.) একটি যৌথ কমিশন হল কোডেক্স অ্যালিমেন্টারিয়াস কমিশন। এই কমিশন খাদ্যের মান দিয়ে বিভিন্ন নির্দেশিকা প্রণয়ন ও সুপারিশ করে থাকেন। কার্টাজেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটি অনুসারে জি.এম ফসলের জেনেটিক্যাল মেটেরিয়ালের প্রতিলিপি তৈরিতে অক্ষম লিভিং মডিফায়েড অর্গানিজমস্ থাকলে তা এই চুক্তির মধ্যে পড়বে। ভারতও এই চুক্তিতে অনুমোদন দিয়েছে।

ভারতে কী কী জি.এম ফসলের চাষ করা হয়?

বর্তমানে বিটি কটন অর্থাৎ তুলার চাষ করা হয়। তবে আগে বিটি বেগুনেরও চাষ হত। তবে তা এখন সাময়িক ভাবে বন্ধ। বর্তমানে ধান চাষের চেষ্টা শুরু হয়েছে। —*অনির্বাণ চক্রবর্তী, মোঃ-৯৪৩৪৬৬০০৪২*

মশা মারার ধূপ

1 পাতার পর

যেমন এক জ্বালা, তেমনি মশা বাহিত রোগও হয়েছে এখন বেশি সমস্যা। দেশের প্রায় চার কোটি মানুষ মশা বাহিত রোগে প্রতি বছর আক্রান্ত হোন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রোগগুলো হল— ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, পীতজ্বর ইত্যাদি। সেই হিসেবে এরা মানুষের পরম শত্রু। এইরকম শত্রুকে প্রতিরোধ করতে প্রতিরোধী ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা দরকার।

মশা মারতে আমরা প্রতি ঘরে ঘরে এখন কয়েল, ম্যাট, ধূপ, লোশন, স্প্রে, লিকুইডেটর ব্যবহার করছি। কিন্তু এগুলো মশার কামড়ের থেকেও যে কত বেশি ভয়ংকর তা চিন্তা করি না। এই সব মশক নিবারকে মশা হয়তো মরছে, কিন্তু আমাদের শরীরে ক্ষতি করে যাচ্ছে অজান্তে। যেমন মশা মারার ধূপ বা ম্যাটে থাকে ডি-অ্যাথ্রিন যৌগ, ডাই ইথাইল টলুমাইড, অ্যালিথ্রিন তৈরি পশুর চামড়া দিয়ে। আরেকটি উপাদান থাকে নাম প্র্যালেথ্রিন। এই উপাদানের তাপধারণ ও তাপসহন ক্ষমতা ও উদ্বায়িতা এই দুটি ধর্ম আছে। রাসায়নিক দুটির কাজ বাড়ানোর জন্য ধূপে অনুঘটক হিসেবে মেশানো হয় অক্টাক্লোরোডাইপ্রপাইল ইথার। এছাড়া আছে ভি অ্যালেথ্রিন, ভি ট্রান্স অ্যালেথ্রিন ইত্যাদি। গবেষকদের মতে এতগুলো উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হল অক্টাক্লোরোডাই প্রপাইল ইথার। সারা রাত ধরে ধূপ জ্বলার ফলে এটি থেকে বিসক্লোরো মিথাইল ইথার (বি.এস.এস.এম.ই) তৈরী হয় এটিই ক্যানসার সৃষ্টির মূল কারণ। অল্প পরিমাণ বি.এস.এম.ই. কয়েকবার শ্বাসগ্রহনে ক্যানসার সৃষ্টির সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়। ধূপ বা ম্যাটের ধোঁয়া ঘরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। মশার শরীর খুব ছোট বলে ধোঁয়ার প্রভাব তাদের উপর পড়ে দ্রুত। বিষ-ধোঁয়া তাদের স্নায়ু অবশ করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় সহজেই। ধোঁয়ার স্থায়িত্ব ঘরে অনেকক্ষণ ধরে হওয়ায় এর ক্ষতিকারক প্রভাব সাধারণ মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু (ঘরে থাকা কুকুর, বেড়াল, পোষা পাখি ইত্যাদি ও পরিবেশের উপর অনেক বেশি মাত্রায় পড়তে থাকে। আমেরিকার পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা কয়েকটি মশাধূপ নিরাপদ নয় বলে সে দেশে প্রবল ভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, চীনের মত দেশে এ ব্যাপারে নিজস্ব আইন প্রণয়ন করেছে। অথচ ভারতে ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে মশা মারার ধূপ, ম্যাট ব্যবহার করে চলেছে। ধূপ ও ম্যাটে যে ফেনল ও অর্থোক্রেসল, এবং প্রচুর ভারী ধাতু থাকে, যা শ্বাস-প্রশ্বাসের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। ধূপের ধোঁয়ার সাথে বিষাক্ত মৌল নাকের মধ্যে দিয়ে সোজা ট্রাকিয়া, ফুসফুসে গিয়ে জমা হয়। কনাগুলো যত ছোট, তাদের স্থায়িত্ব তত বেশি। ফলে রক্তের সাথে তা মিশে গেলে হিমোগ্লোবিনকে ভেঙে দেয় আর তাতে রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ কমে যায়। এতে মানুষ হাঁপানিতে ভোগে বেশি। ধূপের ধোঁয়া বা ম্যাটের গ্যাস থেকে নানারকম অ্যালার্জি হয়। যেমন— আমবাত। ছোট থেকে বড় যে কেউই যখন আমবাতে আক্রান্ত হয় তখন তাদের হাত-পা ও শরীরের অন্যান্য অংশের চামড়া লাল চাকা-চাকা মত হয়ে ফুলে যায়, জায়গাটা বেশ চুলকোয়। ছোটদের 'অ্যাটোপিক ডারমাটাইটিস' হয়। এই চর্মরোগে শরীরে ছোট ছোট ফুসকুড়ির মত বেরোয় আর খুব চুলকোয়। ফুসকুড়ি ফেটে আঠাল রস বের হয়। ছোটদের এটি বেশি হলেও এই রোগে অনেক সময় বড়রাও ভোগে। শীতকালে পরিবেশে দূষণটা বেশি মাত্রায় থাকে। সূর্যের তাপ কম। তাই জীবাণুরা সহজে মরে না। তারাই ধোঁয়ার মাধ্যমে ঢুকে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চালায়। সর্পিলাকারে পেঁচান নানা ধরণের যে কয়েল ব্যবহার করি সেগুলো ক্রিসেন থিমাম বা চন্দ্রমল্লিকার রস থেকে পাওয়া পাইরেথ্রাম ও প্যারাফিন জাতীয় মোম মিশিয়ে তৈরি হয়। কয়েল পোড়ালে গ্যাসে কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেনের নানা অক্সাইড, ডাই ফিনাইল অ্যামিন, ফরম্যালডিহাইড তৈরি হয়। ফরম্যালডিহাইড আমাদের চোখ, নাক, গলাতে অস্বস্তি ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করে এবং সেটা শুরু হয় ০.১ পি.পি.এস. (Part Per Million অর্থাৎ ১০ লক্ষ ভাগে একভাগ) থেকে ১.০ পি.পি. এম. থাকলেই। এটি ফুসফুসের ঝিল্লি এবং চামড়ার ঘা-এর পক্ষে ক্ষতিকর। শিশু বয়স থেকে একটানা এই বিষ-ধোঁয়া নিতে থাকলে এক সময় ক্রনিক ফুসফুসের অসুখ এবং ফুসফুস, নাক-গলার ক্যানসার, হাঁপানির সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়ে। এছাড়া চোখের রোগ বা কর্ণিয়াল ডিজিজ বাড়ে, অন্ধ হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। ধোঁয়ায় যে কার্বনমনোক্সাইড আছে তা নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নিলেও বুঝতে পারি না, কারণ গ্যাসটি গন্ধহীন। শরীরে ঢুকে এটি অক্সিজেনবাহী লোহিত কণিকার সাথে বিক্রিয়া করে কার্বোক্সিহিমোগ্লোবিন (HbCO) তৈরি করে। এতে হৃৎপিন্ডে অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যাবার মতো লোহিত কণিকার পরিমাণ কমে যায়। ডাক্তারদের মতে, HbCO বাড়ার ফলে মানুষ কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং তার মৃত্যুও হতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেশি করে CO নিলে হৃদযন্ত্রের অসুখ বাড়ে। গর্ভস্থ শিশুর বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। CO থেকে সরাসরি ক্যানসার হবার সম্ভাবনা না থাকলেও এর ফলে ফুসফুসের অন্যান্য দূষিত গ্যাস বের করে দেবার ক্ষমতা কমে যায় এবং ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়ে। বদ্ধ ঘরে CO এর বৃদ্ধির ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। নাইট্রোজেনের নানা অক্সাইড ভেঙে দেহে ক্যানসার উদ্দীপক নাইট্রোসো অ্যামিন তৈরি হয়। ডাই-ফিনাইল অ্যামিন থেকেও ক্যানসার হতে পারে। মশা বিতাড়ক রিপেলেন্ট থেকে নির্গত ধোঁয়া ঘরের ভেতর অক্সিজেনটুকু নষ্ট করে দেয়। কারোর হাঁপানি, অ্যালার্জি আগে থেকে থাকলে আর পাশাপাশি মশক-নিবারকগুলো ব্যবহার করে যেতে থাকলে ডাক্তার কিছুতেই আপনার রোগগুলোর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। মশা মারার জন্য বাজারে স্প্রে কিনতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনে এগুলো খুব দেখান হয়। স্প্রে-তে আছে পাইরেথ্রাম। নিত্য ব্যবহার্য জিনিস ও খাবারদাবারের মাধ্যমে এই বিষ ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিষে আক্রান্ত হলে স্নায়ুরোগ, অ্যালার্জি, শ্বাসকষ্ট, গ্যাসট্রাইটিস দেখা দিতে পারে। লেবুর তেলের সঙ্গে ডাই ইথাইল ফিনাইল ফর্মাসাইড মিশিয়ে বানান হয় মশা মারার ক্রিম। এই ক্রিম ব্যবহারের ফলে তা চামড়া শুষে

এরপর 7 পাতায়

মশা মারার ধূপ

6 পাতার পর

নিয়ে মিউকাস মেমব্রেন ও চোখের ক্ষতি করে।

এক সময় মশা তাড়াতে ডিডিটি ও তার সমগোত্রীয় কীটনাশক যেমন ম্যালাথিয়ন, লিনডেন, ডায়াজিনন, পাইরোলান, ফেনথিওন ইত্যাদি ব্যবহার হত। এখন এসব পদার্থে মশা তো মরেই না, বরং বেড়েই চলেছে। এর সাথে সাথে মশা বাহিত রোগগুলো দেখা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ডিডিটি সহ সমগোত্রীয় কীটনাশকগুলোর প্রভাবে ক্ষতিকারক দিক হল যে সুস্থ মানুষের স্নায়বিক উত্তেজনা বাড়ে, কাঁপুনি ও খিঁচুনি হতে পারে। শরীরে ঢুকলে বহুদিন অপরিবর্তিত থেকে ক্ষতি হয়। এগুলোতে উপকারী কীটপতঙ্গের মৃত্যু হয় এবং ধ্বংস হয় ইকোসিস্টেম। এখন সারা পৃথিবীর প্রায় সব দেশে মশা মারার রাসায়নিক দ্রব্যগুলোকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা ভেষজ এবং পরিবেশ বান্ধব মশা দমনকারী পদার্থ ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছে এবং এবিষয়ে গবেষণা অনেক দূর এগিয়েছে। অথচ ভারতের মত দেশে বিভিন্ন বেসরকারী কোম্পানী কয়েকশো কোটি টাকার বিযাক্ত মশা তাড়ানোর উপাদানগুলোর ব্যবসা করে চলেছে। আমরা মূর্খের মত এদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছি। তাই এখনই সজাগ হওয়া দরকার।

মশা ও মশাবাহিত রোগের বৃদ্ধির জন্য আমরা কিছুটা দায়ী। মশার বংশবৃদ্ধি হয় বদ্ধ জলে। যে সব জায়গায় জল আবদ্ধ হয় তা যাতে পরিষ্কার থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। ঘরের চারপাশের নালা নর্দমা, বাথরুম, পায়খানা পরিষ্কার রাখতে হবে। পড়ে থাকা জিনিসে যাতে জল জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এইসব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে আমরা খুবই উদাসীন। আর তার জন্যই আমাদের ফল ভোগ করতে হয়। ঘরের মেঝে মোছার সময় ফিনাইল জলে মেশানো দরকার। এতে মশা-মাছি, পোকামাকড়ের দাপট অনেকটা কমে। শহরাঞ্চলের সেপটিক ট্যাঙ্কও মশার বংশ বৃদ্ধির জন্য দায়ী। তাই ট্যাঙ্কের ভেনটিলেশন পাইপের মুখ পাতলা জালি কাপড়ে বেঁধে রাখা দরকার। মশা মারতে গোল্ড ফিশ, গ্যামবুসিয়া ইত্যাদি যারা শূককীট ও মূককীটগুলোকে খাদ্য হিসেবে খায় তাদের চাষ করার দিকে জোর দিতে হবে। বাদুড়, চামচিকির বংশবৃদ্ধি করা দরকার।

কিন্তু সেই পরিবেশ আছে কি? এক একটা বাদুড় প্রতি রাতে কয়েক হাজার মশা সাবাড় করে দিতে পারে। রাতে ও দুপুরে মশারি ব্যবহার করবেন। মশা তাড়ানোর ধূপ যদি নেহাতই জ্বালাতে হয়, তবে গাছগাছড়া থেকে যেমন নিম থেকে বানানো ধূপ জ্বালানো নিরাপদ। নিম থেকে বানানো ধূপ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। দামেও সস্তা। এছাড়া যারা কুপি, লণ্ঠন জ্বালান তারা এতে তিন-চার ফোঁটা নিম তেল মিশিয়ে জ্বালালে মশা-মাছি মরবে বা ঘর ছেড়ে পালাবে। নিমপাতা ফুটিয়ে কালো করে সেটা এক রাত ভিজিয়ে রেখে পরের দিন থেকে ঘরের চারপাশে প্রায়শই ছিটিয়ে দেবেন। ঘরে মশা-মাছি থাকবে না। নিম তেলে কালাজ্বরের জন্য দায়ী বালি মাছিও মরে যায়। শুধু তাই নয়, এই তেলের গুণটাকে কাজে লাগিয়ে গঙ্গাফড়িং, পঙ্গপাল ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ ধ্বংস করতে বহু দেশ সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। এই তেল তৈরী সহজসাধ্য, সস্তা আর শরীরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। শুধু ইচ্ছে থাকলেই মশারোধে নিজেরা অনেকটা এগোতে পারি। সাথে দরকার একটু সচেতনতা বোধ।

—তুষার কান্তি গলুই, মোঃ-৯৬৩৫৯৩১৩৬২

রিপোর্ট

'রোকেয়া স্মরণ'

১৬ই ফেব্রুয়ারী হজরত মহম্মদের জন্মদিনে চাকদহ রামলাল একাডেমি স্কুলে 'চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা' আয়োজন করেছিল এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভার। বিষয়—'রামমোহন, বিদ্যাসাগর আলোচিত হয়; রোকেয়া কেন নয়।' অনুষ্ঠানের বক্তাদের মধ্যে 'সত্যের দিশারী' পত্রিকার সম্পাদক লোকমান হাকিম আজকের দিনে রোকেয়া বেগমের জীবন দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা এবং কোরানে নারীর অবস্থানের যে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা সমাজে প্রচলিত সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গর্ভনমেন্ট গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পাপিয়া সিংহ মহাপাত্র রোকেয়ার জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে দেখান যে তিনি সারা জীবন অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে নারীকে শিক্ষিত ও প্রগতিশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন। রোকেয়া ইনস্টিটিউট অব্ ভ্যালু এডুকেশন এ্যান্ড রিসার্চের পক্ষে প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, সারা বিশ্বের গবেষকরা যেখানে রোকেয়া চর্চার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন সেখানে আমাদের দেশে সমাজের একটা বড় অংশ রোকেয়ার নামই শোনেনি। তিনি আরও বেশি করে স্কুল-কলেজে রোকেয়ার জীবন দর্শন চর্চা হওয়া উচিত বলে মনে করেন।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

ফর্ম IV

রেজিস্ট্রেশন অব নিউজপেপারস (সেন্ট্রাল) রুলস১৯৫৬-এর ৮ম ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রকাশ করা হচ্ছে ঃ

১। প্রকাশ স্থান ঃ ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড,কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা। পিন- ৭৪৩১৪৫

২। প্রকাশকাল ঃ দ্বিমাসিক

৩। প্রকাশক ঃ জয়দেব দে
৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড,কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা। পিন- ৭৪৩১৪৫
নাগরিকত্ব ঃ ভারতীয়

৪। সম্পাদক ঃ শিবপ্রসাদ সরদার
কেডিয়াবাগান, জোনপুর, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা। পিন- ৭৪৩১৪৫
নাগরিকত্ব ঃ ভারতীয়

৫। মুদ্রক জয়দেব দে
স্ক্রীন আর্ট, ২০, নেতাজী সুভায পথ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা।
নাগরিকত্ব ঃ ভারতীয়

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ঃ জয়দেব দে
৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড,কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা। পিন- ৭৪৩১৪৫
নাগরিকত্ব ঃ ভারতীয়

আমি জয়দেব দে এতদ্দারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ ঃ ১৫ মে, ২০১১

জয়দেব দে
প্রকাশকের স্বাক্ষর
(বিজ্ঞান অন্বেষক)

খাদ্যে ভেজাল ও জনস্বাস্থ্য ঃ ভেজাল হাতে কলমে কিভাবে ধরবেন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর ও সংসদ আয়োজিত অষ্টাদশ পঃ বঃ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস (২৮-০২-২০১১ থেকে ০১-০৩-২০১১) খাদ্যে ভেজাল ও জনস্বাস্থ্য শীর্ষক গবেষণাপত্রটি মনোনিত হয়। স্থান : রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, নরেন্দ্রপুর (কলকাতা), গবেষণাপত্রের সংক্ষিপ্ত সংকলন পত্রিকার এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল। — সম্পাদক

শিশু খাদ্য থেকে শুরু করে দুধ, ঘি, মাখন, ছানা, ভোজ্য তেল, মশলা, চা, কফি, মিষ্টি, ডাল, ময়দা তরিতরকারি কোন খাদ্যই আজ ভেজাল মুক্ত নয়। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার ভেজাল নিরোধক একটি আইন তৈরি করেন। আইনানুযায়ী খাদ্যে ভেজাল দেওয়া সবচেয়ে মারাত্মক সমাজবিরোধী কাজ।

খাদ্য বস্তুটি যে গুণমানের বলে বিক্রি করা হচ্ছে যদি সেই গুণমানের না হয় অথবা খাদ্য বস্তুটিতে বিষাক্ত বা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কোন উপদান থাকে অথবা নিজস্ব উপাদান সরিয়ে নেওয়া অথবা কৃত্রিম ক্ষতিকারক রঙ বা সংরক্ষক মেশানো থাকে তবে তাকে ভেজাল বলে।

সমীক্ষা ঃ

১) বাজারে বা রেল স্টেশনের ঘুগনি, বা আচার বা চাট্ জাতীয় খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা করে জানা গেছে অধিকাংশই বিষাক্ত ভেজাল যুক্ত। কিশোরী রঙ বা কঙ্গোরেড রঙের উপস্থিতি ধরা পড়ে।

২) দুধে জল মিশিয়ে সঙ্গে ময়দা, আটা, অ্যারারুট ভাতের মাড় মিশিয়ে ল্যাক্টোমিটার পাঠ ২৬ ডিগ্রী রাখা হয়। ২৫০টি নমুনা সংগ্রহ করে ২৫টির মধ্যে ক্ষতিকারক রঙ মেটানিল ইয়োলো (কিশোরী রঙ) পাওয়া যায়। ২০০৪ সালে সরকারী দুগ্ধ সংস্থার (বেলগাছিয়া সেন্ট্রাল ডেয়ারী) এক সমীক্ষায় জানা যায় দুধে ইউরিয়া, সোডা, নুন, পামতেল প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর জিনিস মেশানোর ফলে কয়েক হাজার লিটার দুধ বাতিল করা হয়েছিল।

৩) ভোজ্য তেলে ভেজাল এর ঘটনা নিয়মিত ব্যাপার। '৯৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার সেন্ট্রাল ফুড ল্যাবরেটরি থেকে তেলের নমুনা পরীক্ষায় ভেজাল প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও দিল্লির ৬০ জন ব্যবসায়ী সর্ষের তেলে ভেজাল দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত হয়েও জামিন পেয়ে যান।

৪) ২০০৬ সালে এক সমীক্ষা করে জানা যায় উত্তর দিনাজপুরে (ইসলামপুরে) বিপজ্জনক রঙ দিয়ে জিলিপি, বোঁদে, সুরমা, পোলাও, বিরিয়ানি তৈরি হচ্ছে। সমীক্ষায় জানা যায় এর ফলে মানুষের শরীরে লিভারের ও কিডনির অসুখ বেড়ে যায়।

৫) নদিয়া জেলার আই.সি.ডি এস প্রকল্পে সরবরাহ করা ডাল-চাল ভেজাল মেশানোর সময় হাতে নাতে ১ ব্যক্তি ধরা পড়েন। দীর্ঘদিন ধরেই এই ভেজাল চলছিল। ২০০২ সালে জেলার বিভিন্ন পুলিশ প্রশাসন বেশ কয়েকটি বে-আইনী গুদাম সীল করেন।

সরকারী স্তরে ১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১৬৭০ টি খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল যার মধ্যে ২৫৮টিতে ভেজাল প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ৩১টিতে খুব সামান্য সাজা হয়েছিল, বাকিরা রেহাই পেয়ে যান।

শারীরিক ক্ষতি ঃ

বিষাক্ত রাসায়নিক তথা ভেজাল রঙ্ক মেশানোর ফলে মানুষের লিভার ও কিডনির গন্ড গোল, চামড়ার রঙ পরিবর্তন, মাথা ধরা, স্নায়ু দুবর্লতা, স্তনের টিউমার, কিডনি ও ফুসফুসের রোগ, মস্তিষ্কের মোটর নার্ভ নষ্ট করে মানুষকে পঙ্গু করে দেয়,যকৃতে টিউমার, মস্তিষ্কে, মূত্রাশয় ও চোখে ক্ষত সৃষ্টি করে।

খাদ্যে ভেজাল ঃ হাতে কলমে কিভাবে ধরবেন

আপনি রোজ বাজার থেকে যে খাবার কিনে আনছেন, সেগুলি কিভাবে বাড়িতেই হাতে কলমে ধরবেন। কয়েকটি উদাহরণ—

এরপর 11 পাতায়

ইবন-এ-বতুতা

সকাল প্রায় ১০টা। বাড়ির একটু দূরে গাড়ি দাড়িয়ে, সবাই মিলে হৈ হৈ করে উঠলাম, গাড়ি চলল—রসিকবিলে। ৩টে গাড়ি, সবেতেই একদম পা ফেলবার জায়গা ছিল না। নীচে কতকালের সার্ভিসিং না করানো ইঞ্জিন, মাঝে আমরা, উপরে আজকের রান্নার উপকরণ সব। দূষণের শুরুটা বেশ ভালো ভাবেই হল; তবে গাড়িতে বড়োরা একটু সংখ্যায় বেশী তাই এবারের মতো শব্দ ও দৃশ্য দূষণটা হল না। একদিকে ভালোই, অন্যদিকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা বলছে 'প্যায়ারেলাল' ছাড়া পিকনিক এখনও অসামাজিক রয়ে গেল।

গাড়ি চলছে, চলছে হাসি-ঠাট্টা, সমালোচনা, সময়টা মন্দ কাটল না। তবে একটু একা হয়ে পড়ছিলাম, তাই কানে হেডফোন দিয়ে পার্সোনাল স্টিরিওসিস্টেমটা চালালাম—সন্দেসা, সন্দেসা, শান্তনু স্যারের গান আরও এক বার মনে করিয়েছিল প্রকৃতির 'সন্দেসা'— 'আর দিন বেশী নেই'। দু ধারে গ্রাম, মাঝে বাঁকা রাস্তায় অযথা গাড়ির হর্ন। এদিকে কানে 'দিল তো সাচ্চা হ্যায়জি'—গুলজার আর কত সহজে বললেন কথাটা। আমরা যেন বুঝেও বুঝিনা। হ্যাঁতো, এতো 'বাচ্চা' মনে অতো রাখঢাক সয়না। যথা বুড়ো হব তখন দেখা যাবে না হয় দু'চারটে গাছ লাগাবো বাড়ির টবে, বারান্দাটাও সুন্দর হবে,

এরপর 12 পাতায়

জাপানে ভূমিকম্প

1 পাতার পর

দুই উপকূলেই বেশ কয়েকটি করে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে ও দেশে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রথম বসানো হয় ১৯৬৬ সালে কিছুটা পরীক্ষা মূলকভাবে। ১৯৭১ সাল থেকে প্রসারের শুরু। ভূমিকম্প কেন্দ্র উপকূল থেকে ছিল মাত্র একশ কিলোমিটার দূরে। তীব্র কম্পনে রিখটার স্কেলে ৮.৯ যা নিকটের উপকূল শহরের ফুকুশিমার প্রবল ক্ষয়ক্ষতি করে এবং একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উপকূলে বসানো চারটি বড় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের। এই ক্ষতির ধরন সাধারণ ধ্বংস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং তা থেকে যে কতটা বিপদ হবে তার কোন সঠিক পরিমাপ করা এখনই সম্ভব নয়।

পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পরমাণু বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপের সাহায্যে বাষ্প তৈরি করে তা দিয়ে টারবাইন জেনারেটর ঘুরিয়ে তৈরি হয় বিদ্যুৎ। তাপ থেকে বিদ্যুৎ রূপান্তরের দক্ষতা সাধারণ কয়লা বা তৈল-জ্বালানী কেন্দ্রগুলির তুলনায় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কম চলে এই কেন্দ্রগুলি চালাতে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। বাড়তি বর্জ্য তাপ অপসারণের জন্য। এই কারণেই উপকূল অঞ্চলেই এই জাতীয় কেন্দ্র বসানোর ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রাধিকার পায়। জাপান দেশটি সমুদ্র দ্বীপ সমষ্টি। ফলে জাপানের মোট ৫৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অধিকাংশই উপকূল অঞ্চলে এবং পরমাণু বিদ্যুৎ মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের ৩০ শতাংশের কম।

প্রযুক্তি চর্চায় সারা বিশ্বে জাপানের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এই চর্চাকে ধারাবাহিক ভাবে অগ্রাধিকার দিয়েই প্রাকৃতিক সম্পদে ক্ষেত্রে দর্বল এই দেশটি বিশ্বের অর্থনীতিতে দ্বিতীয় স্থানে এসেছে উনিশ শ' সত্তরের দশকে। জাপান ভূমিকম্প প্রধান। এর মোকাবিলায় পূর্ত নির্মাণ ও গঠন শৈলীতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করে প্রতিঘাত ও কম্পন সহ সেতু, অট্টালিকা তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান ভূমিকম্প বহু দূর থেকে দৃশ্যমান উঁচু 'টোকিও টাওয়ার'-এর ক্ষতি হয়েছে সামান্যই। যন্ত্রাদি তৈরি, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও অন্যান্য শিল্পে জাপানের অগ্রগতি অব্যাহতি আছে।

বর্তমান ক্ষেত্রে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে ফুকুশিমার চারটি চুল্লীতে এবং অন্যত্র একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটেছে। শীতল জলের সাহায্যেই চুল্লীগুলির তাপমাত্রা যথাযথ রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। চুল্লীর জ্বালানীগুলি একটু বিশেষ ধরনের। ইউরেনিয়াম-অক্সাইড এর মিহি গুড়ো দিয়ে আধ ইঞ্চির মত ব্যাসের ও ইঞ্চিখানেক লম্বা পেলেট বা ছাঁচে তৈরি করা হয়। সেগুলি খুব উঁচু তাপে পুড়িয়ে শক্ত আকার দেওয়া হয়। এই পেলেটগুলি ১০/১২ ফুট লম্বা জিরকোনিয়ামের মিশ্র ধাতুর পাতলা নলের ভিতর পুরে একটা জ্বালানী দন্ড তৈরি হয়। দেড়শ'র মত জ্বালানী দন্ড তৈরি হয়। এগুলি চৌকোনো প্লেটের উপর একটু ফাঁক ফাঁক করে বসানো হয়। নীচে উপরে প্লেট দিয়ে শক্ত করে আটকে রেখে তৈরি হয় একটি জ্বালানী গুচ্ছ। উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে কতগুলি গুচ্ছ থাকবে। দন্ড ও গুচ্ছগুলি এমনভাবে সাজানো হয় যাতে তাদের মাঝ দিয়ে জল সহজে যেতে পারে।

প্রধানতঃ দু ধরণের চুল্লি হয়—ক) চাপিত জল চুল্লি (প্রেসারাইজড ওয়াটার রিয়্যাকটর) ও (খ) ফুটন্ত জল চুল্লি (বয়েলিং ওয়াটার রিয়্যাকটর)। প্রথমটিতে জলের তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের অনেক উপরে রাখা হয় খুব উঁচু চাপে (চাপ বেশী হলে জল ফোটে অধিক তাপমাত্রায়) এই ক্ষতি উত্তপ্ত জলের সাহায্যে একটি বিশেষ শুধারে সাধারণ চাপে জল ফুটিয়ে বাষ্প করা হয় এবং সেই বাষ্প দিয়েই টারবাইন-জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরী হয়। দ্বিতীয় ধরণের চুল্লিতে ভিতরকার জলকে ফুটতে দেওয়া হয় চুল্লির মধ্যেই তৈরী হয় বাষ্প এবং এই বাষ্প দিয়েই চলতি প্রথায় বিদ্যুৎ তৈরী হয়। এই বাষ্প টারবাইন থেকে বেরিয়ে আসার পর শীতল জলের সাহায্যে ঘনীভরণের আবার জলে রূপান্তর করে চুল্লীতে পাঠানো হয়। উভয় ধরণের চুল্লিতেই শীতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। নিয়ন্ত্রিত বিভাজনের ক্ষেত্রে চুল্লির ভিতরে ও বাইরে জলের সরবরাহ সর্বদাই চালু রাখতে হবে। চাপিত জল ও ফুটন্ত জল চুল্লিতে জলের অভাব ঘটলে, জ্বালানী দন্ডগুলি জলের বাইরে থাকলে, বিভাজনের হার বাড়ে এবং আরও বেশী তাপ উৎপন্ন হয়। এই অবস্থা বেশ কিছু সময় চললে, তাপ বাড়তেই থাকে ও জ্বালানী দন্ডগুলি এক সময় গলতে শুরু করে। চুল্লী বা পরমাণু কেন্দ্রের গর্ভ কক্ষটি তৈরী হয় ৮/১০ ইঞ্চি বা ২০/২৫ সেঃমিঃ পুরু পেটানো ইস্পাতে। দন্ডগুলি গলে গিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি করে তাকে আংশিক গলন বা 'পার্শিয়াল মেল্টডাউন' জল। এই পর্বে ভর্তি তেজস্ক্রিয় জ্বালানী গুচ্ছ গলে গিয়ে চুল্লির নিচে জমা হয়, বাইরে বেরিয়ে আসে না। শীতক জলের অভাব চলতেই থাকলে, গলন্ত দন্ডগুলি নিচে জমা হতে হতে এক সময় চুল্লির নিচটাও গলিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে এ অবস্থাকে বলে সার্বিক গলন বা টোটাল মেল্টডাউন। চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়বে সেই তীব্র বিষবাষ্প বাতাস বাহিত হয়ে অনতিকালের মধ্যেই দূষিত করে তুলতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল যেমনটি হয়েছিল ইউক্রেনের চেরনোবিল পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুর্ঘটনায়, সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে এই দূর্ঘটনায় ১৯৮৬ সাল থেকে শুরু করে ২০১০ সাল অবধি প্রাণ হারিয়েছেন ৯ লক্ষ ৮৫ হাজার জন অধিকাংশই কর্কট রোগে।

চুল্লিতে জলের অভাব হলে তার একটি গুরুতর বিপদ দেখা দেবে। উচ্চ তাপমাত্রায় জ্বালানী দন্ডগুলির বাইরের আবরণ জিরকনিয়ামের মিশ্র ধাতুর সঙ্গে বাষ্পের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরি হবে হাইড্রোজেন গ্যাস, চুল্লি থেকে অতি হালকা এই গ্যাস বেরিয়ে এসে জমা হবে নিশ্ছিদ্র চুল্লি কক্ষে যা ১ মিটারেরও বেশী পুরু কংক্রীটের তেরি অতিকায় শক্তপোক্ত কারণ তেজস্ক্রিয়তার পুরো বিষটাই রয়েছে এর ভিতরে। এদিকে তাপমাত্রা চুল্লিতে বেড়ে চলেছে। জল শুকিয়ে যাচ্ছে,

এরপর 10 পাতায়

জাপানে ভূমিকম্প

9 পাতার পর

ক্রমাগত ভর্তি দাহ্য হাইড্রোজেন গ্যাস চুল্লি কক্ষে জমছে আর চাপও বেড়ে চলেছে। অবশেষে ঐ চাপও তাপমাত্রা ক্রান্তিবিন্দু ছাড়লেই ঘটবে বিস্ফোরণ যার তীব্রতায় গুঁড়িয়ে যাবে ঐ দৃঢ় চুল্লীকক্ষ যেমন ঘটেছে জাপানে। তেজস্ক্রিয় গ্যাস বাইরে বেরিয়ে এসে অসুস্থ করে তুলবে জনপদের পর জনপদ। এর নিয়ন্ত্রণ কি ভাবে হতে পারে তা জানা নেই কারও।

জাপানের ফুকুশিমার চুল্লি চারটেই 'ফুটন্ত জল চুল্লী' ১৯৭০-এর দেশকে আমেরিকার জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী থেকে কিনে এনে বসিয়েছিল টোকিও ইলেক্টর পাওয়ার কোম্পানী বা 'টেপকো'। চুল্লিগুলির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি বন্ধ করে দেওয়াই প্রথা এই বয়স্ক চুল্লীগুলির। এই মার্চ মাসেই বন্ধ করা হচ্ছিল একটি। তার আগেই ঘটে গেল এই মারাত্মক দুর্ঘটনা। এখন অবিরত চেষ্টা চলছে যতটা সম্ভব তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে। কারণ তেজস্ক্রিয়তার বিষ মোকাবিলার ব্যবস্থাদি করে ওঠা যায়নি। এই বিষ দেহস্থ হলেই অপসৃত হবে তা নয়। মৌলধর্ম অনুযায়ী এ বিষ কমবে অর্দ্ধজীবনের হিসাব ধরেঃ তেজস্ক্রিয় আইওডিন এর অর্ধজীবন ৮দিন প্লুটোনিয়ামের অর্ধজীবন প্রায় ২৪ হাজার বৎসর। (অর্ধজীবন বিকিরণ তীব্রতা- অর্ধেকে নামতে যতটা সময় লাগে)

ভারত সরকার চুল্লীগুলির নিরাপত্তা যাচাই করছেন বলে আশ্বস্ত করেছেন দেশবাসীকে। কারা যাচাই করছেন? আণবিক শক্তি বিভাগের সরকারী বিজ্ঞানীরাই এই 'অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরী বোর্ড'-এর পদাধিকারী। ইতিমধ্যে এই বোর্ডটির প্রধান ডঃ এ. গোপালকৃষ্ণান কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর অনুসন্ধানের একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন তাতে ১৩২টি বিচ্যুতির বিবরণ ছিল। প্রতিবেদনটিতে সঙ্গে সঙ্গেই গোপনীয় ছাপ মেরে কোথায় রাখা হয় তার সন্ধান বাইরের কেউই পাননি। বিচ্যুতিগুলির প্রতিকার কি হল তাও কেউ জানেন না।

জাপানী পরমাণু বিদ্যুৎ শিল্পে যাঁরা যুক্ত আছেন তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সারা বিশ্বে প্রথম শ্রেণীর মানতে বাধা নেই। তাঁরা এই বিকট বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে অসহায় বোধ করছেন। ইতিপূর্বে আমেরিকার থ্রি মাইল আইল্যান্ড কেন্দ্রে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার চেরনোবিল কেন্দ্রের দুর্ঘটনায় অনুরূপ অবস্থাই হয়েছিল আমেরিকান ও সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের।

এই পরিস্থিতিতে চিরকালের জন্য দূরে রাখতে ভারতের পরমাণু চুল্লীগুলি অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। এতে এ দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন কমবে মাত্র ৩ শতাংশ। এই হ্রাস জনজীবনে যে কোন প্রভাবই ফেলবে না তা দায়িত্ব নিয়ে বলা যায়।

এখনই সারা দেশ জুড়ে দাবী উঠুক পরমাণু কেন্দ্রগুলি অবিলম্বে বন্ধ করার।

—ডঃ সুজয় বসু, মোঃ-৯৪৩৩৪১৩২২৪

১৭ই মার্চ, ২০১১

পরমাণু শক্তি কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে নয় ভারতে নয় পৃথিবীর কোথাও নয়

"পরমাণু শক্তি কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতে নয়, পৃথিবীর কোথাও নয়"

জাপানে সাম্প্রতিক ভূমিকম্প ও সুনামির ফলে সেখানকার পরমাণু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ভয়ংকর বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। ফলতঃ তেজস্ক্রিয় দূষণে সে দেশের জল, মাটি, বাতাস, মানুষ সহ জীবকূল সকলেই এই দূষণে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। হিরোশিমা-নাগাসাকির পরে জাপান আবার এই পারমাণবিক দূষণে আক্রান্ত। পরমাণু বোমা নিক্ষেপের ফলে হিরোশিমা-নাগাসাকিতে বাতাসের মাধ্যমে যে দূষণ ছড়িয়েছিল, এবার পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনার ফলে সেই তেজস্ক্রিয় দূষণ আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়বে কারণ ঐ পরমাণু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলি অবস্থিত সমুদ্রতীরে। ফলে সমুদ্র জলের ও তেজস্ক্রিয় মেঘের মাধ্যমে তা আক্রমণ করবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিতে।

গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পঃবঃ '৮২ থেকেই পরমাণু বোমা এবং পরমাণু শক্তির বিরোধিতা করে আসছে। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ উন্মাদ তথা ক্ষমতা উন্মাদরা পরমাণু বোমা ও সেই বোমা উৎপাদনের জন্য পরমাণু শক্তি কেন্দ্র স্থাপন করছে একে অপরকে ভয় দেখাতে আর কেবল 'মুনাফার' জন্য। পরমাণু শক্তিকেন্দ্রগুলি যে মোটেই নিরাপদ নয় তা থ্রি-মাইল আইল্যান্ড, চেরনোবিল পরমাণু শক্তি কেন্দ্রগুলির দুর্ঘটনা অনেক আগেই প্রমাণ করেছে। এইসব কারণে পরমাণু বিদ্যুৎ শক্তির জন্য ইউরোপ, আমেরিকায় নতুন কোন চুল্লি বসানো হচ্ছে না। অথচ সাম্প্রতিক কালে ভারত-আমেরিকা অসামরিক পরমাণু চুক্তির মাধ্যমে ভারতের সমুদ্রোপকূলবর্তী ৬টি গ্রামে, যার মধ্যে আছে পশ্চিমবঙ্গের হরিপুর, পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। এই জায়গাগুলির মধ্যে কয়েকটি ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা এবং সুনামি প্রবণও।

এর আগে যখনই পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু শক্তি স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে, গণ-বিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ তখনই তার বিরোধিতা করেছে। জাপানের সাম্প্রতিক ভূমিকম্প ও সুনামি আবার প্রমাণ করল পরমাণু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলি পরিবেশের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর হতে পারে। তাই আমরা পুনরায় দাবী জানাচ্ছি অবিলম্বে পরমাণু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ হোক, চালু কেন্দ্রগুলি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করতে হবে, অন্যথায় বিশ্বজুড়ে হিরোশিমা-নাগাসাকি-দাইচি ঘটেই চলবে। ফলে ধ্বংসের পথে যাবে গোটা পৃথিবী। ভারতে পরমাণু শক্তি কেন্দ্রগুলির গবেষণা ও দুর্ঘটনার তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশের আইনি স্বীকৃতি দিতে হবে। জাপানে সমস্ত আক্রান্ত মানুষের প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

—গণ বিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের পক্ষে অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য, ১৪-০৩-১১

খাদ্যে ভেজাল হাতে কলমে কিভাবে ধরবেন

খাদ্য	ভেজাল রং	ভেজাল কিভাবে হাতে কলমে ধরবেন
১) মিহিদানা, বোঁদে, লাড্ডু, জিলিপি, বেবি ফুড, ডাল	কিশোরী রঙ (মেটানিল ইয়েলো)	হলুদ রঙের জন্য খাবারটিতে একটি পাত্রে নিয়ে কয়েক ফোটা লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) মেশালে মিশ্রণ গোলাপী বর্ণ হলে বুঝতে হবে খাদ্যে কিশোরী রঙ আছে।
২) শুকনো লঙ্কা, রাঙা আলু, জেলি, সস্, জ্যাম, লজেন্স, চকোলেট, সিরাপ প্রভৃতি।	লাল রঙের জন্য কঙ্গো রেড ও রোডামিন-বি ব্যবহার করা হয়।	১) তরল প্যারাফিনে তুলো ভিজিয়ে রঙীন খাবারের গায়ে ঘযলে তুলো লাল হবে। ৩) রোডামিন-বি মেশানো রঙীন খাবারে কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড যোগ করলে রঙ অদৃশ্য হবে। পরে আবার লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) যোগ করলে লাল রঙ ফিরে আসবে।
৩) সবুজ সব্জি, জেলি, সস্, জ্যাম, চকোলেট, মটরশুটি, লজেন্স।	সবুজ রঙের জন্য ম্যালাকাইট গ্রিন ব্যবহার করা হয়।	তরল প্যারাফিনে ভেজা সাদা তুলো দিয়ে ঘযতে থাকুন। তুলো সবুজ হলে বুঝতে হবে খাদ্যে ভেজাল হিসেবে ম্যালাকাইট গ্রিন আছে।
৪) দুধ	জল, অ্যারারুট, আটা, ভাতের মাড়, ময়দা, চিনি, বাতাসা, ইউরিয়া, সোডা প্রভৃতি।	১) ল্যাক্টোমিটার পাঠ ২৬° এর কম হলে বুঝতে হবে দুধে জল মেশানো হয়েছে। পাঠ ঠিক রাখতে ভাতের মাড়, অ্যারারুট, ময়দা সহ বিভিন্ন স্টার্চ মেশানো হয়। টিংচার আয়োডিন বা আয়োডিন দ্রবণ মেশালে দ্রবণ নীলবর্ণ হবে (স্টার্চ আয়োডাইট তৈরী হয় এর বর্ণ নীল)। ২) ৫ মিলি দুধে ১ চামচ ঘন (HCl) অ্যাসিড ও ১ চামচ চিনি মিশিয়ে রাখলে দ্রবণ লালবর্ণ হবে। ৩) ২০ মিলি দুধে সামান্য রোসালিক অ্যাসিড দিলে দ্রবণ (দুধ) গোলাপী বর্ণ হবে। ৪) ১০ মিলি দুধে ১ চামচ অড়হর ডালের গুড়ো বা সোয়াবিনের গুড়ো মিশিয়ে ৫ মিনিট পরে লাল লিটমাস-এর রঙ নীল বর্ণ হবে। ৫) ৫ মিলি দুধে ২ মিলি ঘন (HCl) অ্যাসিড সহ ৫০ মিগ্রা রিসরসিনল মিশিয়ে গরম করলে দ্রবণটির বর্ণ লাল হবে।
৫) ঘি, মাখন	ডালডা (বনস্পতি), আলুসিদ্ধ	টেস্ট টিউবে এক চামচ ঘি বা মাখন নিতে হবে। ১ চামচ ঘন (HCl) অ্যাসিড ও সামান্য চিনি নিয়ে মিশ্রণটিকে সামান্য গরম করে ঝাঁকাতে হবে। পরে দ্রবণ-এর নীচের স্তর গাড় খয়েরী রঙ ধারণ করবে। বুঝতে হবে ঘি বা মাখনে ডালডা বা বনস্পতি মেশানো আছে। ঘিয়ে আলু সিদ্ধ মেশানো হয়। ঘি গলিয়ে তার মধ্যে সামান্য টিংচার আয়োডিন বা আয়োডিন দ্রবণ যোগ করলে নীলবর্ণ হবে।
৬) মুড়ি	ইউরিয়া : মুড়িকে বেশি সাদা ও ফোলা করার জন্য ব্যবহার করা হয়।	অল্প পরিমাণে মুড়ি অল্প জলে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরে ছেঁকে জল সংগ্রহ করে তাতে ২ চামচ অড়হর ডালের গুড়ো মিশিয়ে সামান্য গরম করে ৫ মিনিট রেখে দিতে হবে। দ্রবণে ফিনপ্থ্যালিন মেশালে গোলাপী বর্ণ হবে। বুঝতে হবে মুড়িতে ইউরিয়া আছে।
৭) সর্ষের তেল (ভোজ্য তেল)	শিয়াল কাঁটা বীজের তেল, রেড়ির তেল, ধুতুরা	১) উনুনে চাপালে যদি বেশী ফেনা হয়, অস্বাভাবিক গন্ধ ছাড়ে বা রঙ চলে যায়। ২) তেল এবং ঘন নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) ১:২ অনুপাতে ঝাঁকাতে হবে, অ্যাসিড স্তর লাল হলে বুঝতে হবে শিয়াল কাটার বীজের তেল আছে।

ইবন-এ-বতুতা

৪ পাতার পর

আর কিছুটা অক্সিজেনও মিলবে। খোরাই অন্যদের জন্য আপনি বাঁচলে বাপের নাম; আর বলতে তো পারব গাছ লাগিয়েছি। কথাগুলো কানে মনে বলতে বলতে এসেই পড়লাম রসিকবিলে। একে একে গাড়ি থেকে নামা হল, নামল জিনিসপত্র খাবার ও অনেকখানি শব্দ। বাইরের সঠিটাতে চলছে অনেক রান্নার আয়োজন, পিকনিক স্পট বলে কথা। তা এটুকু ছাড় দেওয়াই চলে, প্রকৃতিও দেন, হয়তো ভাবেন ছেলে মেয়েরা গায়ের কোলে এসেছে এটুকুতো করবেই, ছেলে মানুষ তো! তবে ছেলে মানুষইটা যে কি সাংঘাতিক তা বুঝে কপাল চাপড়ান একটু পড়েই সত্যি আমারও ভুল হয়, এই ভারকি আর সইতে পারি! আজকাল মাথাটাও বিগরোচ্ছে অল্প অল্প করে। এদিকে আমরা খুজছি কোথায় রান্না করা যায়? একটু পড়েই বড়মামাদের গাড়িটা এল। মামা বললেন গেষ্ট হাউস বুক করা আছে ওখানেই চল। কেউ গ্যাস সিলিন্ডার, কেউ বাঁধাকপি, কেউ আবার নিজেকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌছোলেন।

ফ্রেশ হয়ে গেষ্ট হাউসের মাঠে মাদুর পেতে বসা হল আর একদিকে রান্নার আয়োজন। ২৫শে ডিসেম্বর তাই কেক দিয়েই শুরু। এরপর রান্নার কাজটা একটু গুছিয়ে ঠাকুরের হাতে দিয়ে রসিক বিলের 'জু' এর উদ্দেশ্যে যাত্রা। প্রকৃতি, আকাশ, গান, ভালো লাগে বরাবরই ছোটো থেকেই। বন্ধুর সাথে দেখা অনেকদিন পর তাই বদলটা নজরে পড়ল প্রথমেই, যেমনটা হয় প্রাণের বন্ধু বলে কথা। কেউ নজরে পড়ল, হামেসাই পড়ে, পলিথিন নিয়ে প্রবেশ নিষেধ। রাস্তায় পড়ে আছে কিছু, বাধাও দেওয়া যাবে না; যুক্তি এসব তো রজনীগন্ধা পলিথিন কোথায় লেখা মশাই! এসব কথা মনের ওপারে রেখেই এগোলাম, রাস্তা থেকে ভেতরের দিকে নেমে কিছু ছবি তুললাম, ছবি আঁকতে পারি না, তুলে যতটুকু সাধমেটে আরকি! এর মধ্যেই এক ভাই ছুটে গেল, ভাবল দাদা তাড়াতাড়ি এসো। বুঝলাম কিছু একটা হয়েছে, এত ভিড় কেন? একটু এগোতেই দেখলাম ময়ূর পেখম তুলেছে। কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়েছিলাম প্রকৃতির মন্ত্রে। খানিক পরে ক্যামেরাটা বের করে কিছু মুহূর্ত বন্দি করতে ব্যস্ত হলাম অন্য সবার মত। একটু এগোতেই আরেকটি খাঁচার ভেতর দেখা মিলল অজগর, বাবু হয়ে ঘুমোচ্ছেন, তাকে বিরক্ত না করে চললাম কুমীরদের সাথে একটু চোখ - গল্প করতে। বড়ো পুকুর কয়েকটিতে দেখলাম, রোদ পোহাতে ব্যস্ত পাড় ধরে এগোতে লাগলাম কিছুটা এগোতেই চোখে পড়ল কিছু ছেলে কুমীরগুলোকে ঢিল ছুড়ছে, ওদের কথাও কানে আসছিল—এরকম করেই নাকি ওরা আগে এক কুমীরকে মেরেছে। ওদের কাছে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম।

এদিকে আমরা দুইজন গোটা দল থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছি একটু পরেই হুস ফিরল, যেতে যেতে রাস্তায় একদল পিঁপড়ে চোখে পড়ল, ঘরে ফিরছে মনে হয়। ভূপালবাবুর ক্লাসে বলা পিঁপড়ে দেখার দলকে মনে পড়ে গেল। নিজেকে গল্পের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করলাম। পারলাম না ঐ চোখটা যে এখনও পাইনি। ছোট ঝুলন্ত সেতু পেরিয়ে ওদের ডেরায়—রাস্তায় একদিকে হরিণ অন্যদিকে বাঘ, অনবদ্য Combination। কিন্তু এদিকে হরিণদের একজনও দেখা নেই। ভাবছিলাম রাগ না অভিশাপ ওদের ওপর অত্যাচার রাগ হবেই না বা কেন? অপেক্ষার ভার বেশিক্ষণ বইতে হল না। দেখা মিলল একে একে অনেকের। আমিও মন ভরিয়ে ক্যামেরা ভরতে লাগলাম।এবার গেস্ট হাউসের দিকে পা বাড়ানো, পেট সবার চোঁ চোঁ করছে যে। মনটা ভরেনি। ওয়াচ টাওয়ারে উঠলাম ছবি তুললাম মন ভরে দেখলাম চারিদিক এবার আর পেটকে রাখা যাচ্ছে না প্রায় দৌড়েই পৌঁছালাম গেস্ট হাউসের দিকে।

একটু পরে খেতে বসা হবে, আয়োজনে ব্যস্ত বড়রা। রান্নার দিকে এগোতেই চোখ আটকালো পড়ে থাকা সব্জি, মাছ ও মাংসের অপ্রয়োজনীয় অংশের দিকে। খাওয়া দাওয়া হল শেষে স্পেশাল বেগুন ভাজা। সব উচ্ছিষ্ট ফেলা হল— শুরু হল কুকুরদের বনভোজ প্রতিদিনের মত। একগুচ্ছ মৃত্তিকা বায়ু দূষণ ঘটিয়ে আমরা হাঁটা দিলাম গাড়ীর দিকে। গাড়ী এগিয়ে চলল আবার সময়টা কাটানোর জন্য কানে হেড ফোন। মুহূর্তের মধ্যে এক লরির সঙ্গে ধাক্কা। গাড়ী গিয়ে ধাক্কা মারল গাছে। কিছু সময় ঘোরেই কেটে গেল। লোকজন জড় হয়ে গেছে অপেক্ষা আর দুটো গাড়ী আসার। মোবাইলও কাজ করছে না। গাড়ীগুলো আসতেই একটিতে করে আমি ও এক দাদা বাদে সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ডাক্তারের কাছে, সবারই আঘাত গুরুতর। অনেকটা আশ্চর্য ভাবেই আমার ও ঐ দাদার গায়ে একটিও আচড় লাগেনি। এবার আরেকটা গাড়ী করে চললাম বাড়ী ফিরতে। না জানি হয়ত আজ প্রকৃতি এই ঘটনাটি ঘটিয়ে আমাদের আরেকবার ছেলেমানুষির বকা দিলেন।

— দেশপ্রিয় রায়, ফোন-৭৫০১৮৭৪৯৬৫
E-mail : deshapriyoroy@gmail.com

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০) *E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in*